**সুশাসন, বাংলাদেশর আর্থসামাজিক রাজনৈতিক উত্তরণ ও তাজউদ্দীন আহমদ**

## অংশগ্রহণকারীর তথ্য:


মো: হাবিবুর রহমান হাবিব
রোল নং: ১৫, ৪র্থ ব্যাচ,
৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ: ২০০৯- ২০১০
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।
ই- মেইল: habib7898@ gm ail.com
মুঠোফোন: ০১৭৩৯০৫১০৫৭


## বর্তমান ঠিকানা:


কক্ষ নম্বর: ৪০,
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।


Rgv`v‡bi ZwiL: 20 Rb, 2012

“আসুন, আমরা এমনভাবে কাজ করি ভবিষ্যতে যখন ঐতিহাসিকেরা বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করবে তখন যেন আমাদের খুঁজে পেতে কষ্ট হয়” । - ZvRDÏxb Avng`

বিশ্বে প্রায় ২০০ এর অধিক রাষ্ট্র আছে । যার মধ্যে গুটিকয়েকটি রাষ্ট্র পরাধীন এবং অধিকাংশই স্বাধীনতা লাভ করে গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করছে । যদি ও উন্নত রাষ্ট্রগুলো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এখনও বিভিন্ন মাধ্যমে তাদেরকে শোষণ করছে । অনেক ত্যাগ তীতিক্ষার বিনিময়ে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতা লাভ করেছে । এ স্বাধীনতা লাভ করার পিছনে বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তিবর্গ জড়িত থাকেন । যারা ঐ স্বাধীনতা লাভে কান্ডারীর ভূমিকা পালন না করলে স্বাধীনতা নামক সোনার হরিণটি লাভ করা যায় না । এমনই এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা লাভের পথপ্রদর্শক ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ । যিনি ছিলেন একাধারে সফল সংগঠক, সফল প্রধানমন্ত্রী ও সুদক্ষ অর্থমন্ত্রী । বিশ্বের ইতিহাসে বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি ছিলেন অন্যতম । বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে । শিশুকাল, কৈশর ও যৌবনে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন । বাল্যকাল থেকেই তিনি রাজনৈতিকভাবে সচেতন, কর্তব্যপরায়ণ ও চিন্তাশীল এবং সর্বোপরি উন্নতর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন । বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে তিনি বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন । বিশেষভাবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ । তিনি মূলত ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে রাজনীতির অহংকার । যিনি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মত রাজনৈতিক গুণাবলীর সমন্বয়ে গঠিত একজন মানুষ । বৃটিশ উপনিবেশিক ও পাকিস্তান আমলে সুশাসন, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক উত্তরণের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক প্রকৃতির । তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ৫০ বছরের জীবনে সুশাসন ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন । যার মিশন ও ভিশন সুন্দর ও সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছিল । কিন্তু কিছু অপশক্তি সে আশা ও ভরসা ধূলিৎসাৎ করে দেয়ার জন্য ১৯৭৫ সালে ৩ রা নভেম্বর তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করে । কিন্তু তাদের আশা পূরণ হয়নি । মরেও তাজউদ্দীন আহমদ কোটি কোটি বাংলাদেশী ও অ-বাংলাদেশীদের হৃদয়ে স্থান করে আছেন । তিনি প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন । তিনি কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী ছিলেন । বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক উত্তরণে তাজউদ্দীনের ভূমিকা বিরল । সমাজ

ও জাতির আশা, প্রত্যাশা ও চাহিদাপূরণে তিনি সদায় সোচ্চার ছিলেন। দেশ, জাতি ও সমাজের সমৃদ্ধি ও উন্নতি সাধনে তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন। রাষ্ট্র সমাজ ও জাতি গঠনে তাঁর অবদান অপরিসমি। অত্র লেখায় তাজউদ্দীন আহমদের পরিচিতি, জীবনকর্ম, জীবনাদর্শন, সুশাসন ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক উত্তরণে তাঁর ভূমিকা তুলে ধরা হল।

gvÎ 50 eQ‡ii hvÎvq ZvRDÏxb Avng`:

তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন একটি ফুলের মত। যাকে কিনা অপশক্তিরা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিল। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সফল ও দক্ষ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর ঢাকা জেলার (বর্তমান গাজীপুর) কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে বাংলাদেশের জন্য আলোকবার্তিকা ও পাঞ্জেরী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নাম মোহাম্মদ ইয়াসিন খান এবং প্রাণপ্রিয় মাতার নাম মেহেরুন্নেসা। তিনি মূলত গ্রামের স্কুল থেকে প্রাথমিক ও মধ্য ইংরেজি স্কুলে পড়া-শুনা সমাপ্ত করেন। তারপর তিনি ঢাকা সেন্টগ্রেগরি স্কুলে ভর্তি হন। তিনি ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে। ১৯৪৮ সালে আই এ এবং ১৯৫১ সালে অর্থনীতিতে বি.এ. অর্নাস পাস করেন। তাঁর স্কুল জীবন থেকে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়। তিনি বিভাগপূর্বকালে মুসলিমলীগে যোগ দেন। ১৯৪৯ সালে তারপর মুসলিম আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তিনি এম এস এ নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে তিনি আওয়ামীলীগের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দান করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তারপর ১৯৬৬-৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি জেলে বন্ধী জীবন-যাপন করেন। ১৯৭০ সালের দিকে তিনি এম এম এ নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে এক যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় একজন দক্ষ সফল ও যোগ্য অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তাকে বিশেষ আইন প্রয়োগ করে জেলে পাঠানো হয়। মাত্র ৪৯ বছর ৩মাস ১০ দিন বয়সে তাঁকে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিমর্মভাবে হত্যা করা হয়। যা ছিল জাতির জীবনে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়। তাঁকে বনানী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পরিচালনা করে সফল নেতৃত্ব দিয়ে এবং

একজন সুদক্ষ, সুযোগ্য ও সফল পাঞ্জেরীর ভূমিকা পালন করে তিনি বাংলাদেশের সূর্য ছিনিয়ে এনে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেন।

## cwiewiK Rxeb hvc‡b ZvRDÏxb Avng`:

তাজউদ্দীন আহমদ পারিবারিক জীবন-যাপনে অনেকটা বৈরাগীর মত ছিলেন। তিনি পারিবারিক জীবনে ও ছিলেন সফল। তাজউদ্দীন আহমদ শুধু একজন সফল রাষ্ট্র নায়কই ছিলেন না, অন্যদিকে শুধু সফল অর্থমন্ত্রীই ছিলেন না, তিনি একাধারে ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ, আদর্শ পিতা ও আদর্শ স্বামী। মাত্র ২০ বছর বয়সে পিতাকে হারালেন। অন্যদিকে ১৯৪৪ সালে বড় ভাই ওয়াজউদ্দিন মৃত্যুবরণ করলেন। যার জন্য তরুণ বয়সে তাঁকে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। তাঁর পারিবারের আয়ের অন্যতম উৎস বন সম্পদ। তিনি নিজেকে একজন সমাজসেবক হিসেবে ভাবতেন। পাশাপাশি সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য চেষ্টা করতেন। সংসার জীবন পরিচালনা করাটা ছিল তাঁর কাছে উদাসীন বিষয়। ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকা কলেজের তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সৈয়দ সিরাতুল হকের কন্যা সৈয়দা জোহরা খাতুনকে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর ডাক নাম ছিল লিলি। তিনি তাঁকে লিলি নামে ডাকতেন। সংসার জীবনে তার ৩ মেয়ে এবং এক ছেলে। তাঁর মেঝ মেয়ে সিমিন হোসেন রিমি একজন সুগবেষক, লেখিকা এবং বক্তা।

## ZvRDÏxb Ges ‡Rvniv LvZb wjwj:

তাজউদ্দীন আহমদ সত্যিই একজন যোগ্য সাথী এবং ভাল সঙ্গিনী হিসেবে জোহরা বেগম লিলিকে খুঁজে পেয়েছেন। অন্যদিকে জোহরা খাতুন ও একজন ভাল সাথী এবং স্বামী হিসেবে খুঁজে পেয়েছে তাকে । তাঁদের জুড়িটা ছিল খুবই সুন্দর। একেবারে বলা যায় যে, সোনায় সোহাগা। সংসার জীবনে উভয় জন উভয়জনের প্রতি ছিলেন আন্তরিক এবং শ্রদ্ধাশীল। কখনো তাঁদের মধ্যে সমস্যা দেখা যায় নি। জোহরা তাজউদ্দীনের স্থলে অন্য কেউ হলে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা করা তাজউদ্দীনের পক্ষে হয়ত অসম্ভব হয়ে পড়ত। তিনি বিপদে আপদে স্বামীকে তাঁর কাজে কখনো সমস্যার সৃষ্টি করেন নি। পরিবারের চেয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতেন।

**স্বপরিবারের প্রতি ও সাধারণ জনগণের প্রতি একই অনুভূতির ও ভালবাসার প্রকাশ:**

তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। যিনি তাঁর পরিবারকে অন্য যে কোন জনসাধারণের পরিবারের মত সামন চোখ দেখতেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর তথাকথিত অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ন্যায় নিজ পরিবারেরকে অন্যদের চেয়ে আলাদা ভাবতেন না। স্বপরিবারের লোক অন্যদের মতই ছিল সমান ভালবাসার এবং আদরের পাত্র ।বলা যায় যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে স্বপরিবারের প্রতি উক্তিটি তারই ইঙ্গিত বহন করে । যা তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় সহধর্মিণী জোহরা তাজউদ্দীন ওরপে লিলির প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন।

"ছেলে- মেয়ে নিয়ে তুমি সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে মিশে যেও । কবে দেখা হবে জানি না ...মুক্তির পর"। প্রবাসী সরকার পরিচালনা করার সময়ে ও তিনি সাংসারিক জীবন যাপন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কারণ তিনি মুক্তিযুদ্ধোদের কষ্ট অনুভব করতে চেয়েছিলেন। বাস্তবেও তিনি তাই করেছেন।

ZvRDÏxb Avng‡`i Ae`vb:

বৃটিশ ও পাকিস্তান বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে তাজউদ্দীন আহমদ সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন । বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠায়, সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনে, সুশাসন, এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক উত্তরণে তাজউদ্দীনের আহমদের ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম । যার কিয়দাংশ নিম্নে তুলে ধারা হল-

**বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রাজনীতির ইতিহাসে তাজউদ্দীন আহমদের অবদান ও কীর্তি:**

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তাজউদ্দীন আহমদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।তিনি বিভিন্ন ধরণের আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন।তন্মোধ্যে উল্লেখিত হল, ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ৫২'এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কর্ণধার। আওয়ামীলীগের ৩৫ বিধি ও তিনি প্রণয়ন করেছেন। মূলত তাজউদ্দিন আহমদের জ্বালাময়ী, উদ্দীপনাময় ভাষণ পাশাপাশি ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল ও ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের শপথ শুনে বরগুনার আপামর জনসাধারণ সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদেরকে বাংলার মাটি থেকে দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর

হয়। তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব দেন। ১৯৫৪ সালে ছাত্র জীবনে আইনসভার সদস্য হয়েছে, ৬ দফা আন্দোলনে দীর্ঘদিন কারাবরণ করেছেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে বাংলার ইতিহাসে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন।

RvZxq †bZv:

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবং বাংলাদেশের আপামর জনগণের নেতা চারজন এক কথা সর্বজন স্বীকৃত হয়ে আছে। তাঁরা হলেন, হাসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদখান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। পঞ্চমস্থানে তারঁপর ইতিহাসবেত্তারা তাজউদ্দীন আহমদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন (সিরাজউদ্দিন আহমেদ, ২০০৮)। অন্যদিকে উপরোল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের পর জাতীয় নেতা হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম সমধিক পরিচিতি ছিলেন। একজন দক্ষ জাতীয় নেতা ও জাতীয় ঐক্যের জন্য কাজ করে যাবেন এটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। আর সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নকার্মী দেশের উন্নয়নের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা ও অসীম যা কোন অংশে কম নয়। তাজউদ্দিন আহমদ তা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সে লক্ষ্যে সামগ্রিক সমঝোতা ও গড়ে তুলতে ও প্রয়াসী হন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নানা মুখী চাপ সত্ত্বে ও জাতীয় তিনি মিলিশিয়া গঠন করেন। আর এর পরিচালনার জন্য ২ জানুয়ারী ১৯৭২ সালে সকল রাজনৈকি দল থেকে একজন করে সদস্যনিয়ে গঠিত হয় জাতীয় মিলিশিয়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড। পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য ও সমঝোতা বাড়ানোর জন্য দলীয় কর্মী, নেতা ও সমর্থকদের কাছে ও আকুল আবেদন জানান। আমাদের আজকে সংগ্রাম অর্থনেতিক মুক্তির সংগ্রাম, সামাজ্যবাদী প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেশের পূণগঠনে যেন আমরা প্রত্যেকেই মানুষের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজে অগ্রসর হতে পারি। সেটাই আজকের বড় প্রার্থনা। দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে সহনশীলতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। কেননা সহনশীলতা ছাড়া গণতন্ত্রের ভিত্তি রচিত হতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি জাতি গঠনের জন্য সর্বদলীয় ঐক্য কাঠামো জাতীয় সমঝোতার লক্ষ্যে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গড়ে তুলতে তিনি সক্রিয় হয়েছিলেন।

এই আপোসহীন, রুদ্ধধার মুক্তিকামী নেতাকে তাঁর বিদেশী শত্রুরা ও ভয় করবে। ভুট্রো একবার তার সহচরকে বলেছিলেন,

"আলোচনা বৈঠকে তার মুজিবের পেচনে ফাইল বুগলে চুপচাপ যে নটোরিয়াস লোকটি বসে থাকে তাকে কাবু করা শক্ত। This Tajuddin! I tell you, will be your main problem. He is very thorow. শেখের যোগ্য লেফটেন্যান্ট আছে দেখছি"[১]।

বাইরের অপশক্তি কথায় এতটা বিরক্তি প্রকাশ করত এবং ষড়যন্ত্রের জাল কতটাই ছিল অনেকটাই তীব্র এবং কাঠিন্য ছিল! তা বুঝা গেল আরেকবার। তাজউদ্দীন ছিলেন মনে প্রাণে একজন গণতান্ত্রিক ও পরমত সহিষ্ণু ব্যক্তি। তিনি শক্তিশালী নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের প্রত্যাশা করতেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষ করতে চাননি। সংবাদপত্র প্রশাসনের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে দুর্ভিক্ষের মতো অর্থনৈতিক সংকট এড়াতে সাহায্য করবে, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সহায়তা করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। একই সঙ্গে ছিলেন নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী এবং অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাবে। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ৬ তারিখে বঙ্গবন্ধু একটি মাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দল বা হিসেবে বাকশাল গঠন করেন এবং বাকশাল বাদে অন্য সব দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও পুজারী তাজউদ্দীন আহমদ বাকশালের কোন কমিটিতেই ছিলেন না। তিনি তার বন্ধু ও নিকটজনের কাছে এর ভয়াবহ পরিণতির কথা বললে ও ক্ষেত্রে বিশেষে অভিমানে সুখ-দুঃখের দীর্ঘদিনের সাথী শেখ মুজিবকে কিছু বলেননি। তাজউদ্দীন তাঁর নেতার দৃঢ় সংকল্প সম্বন্ধে ছিলেন সম্যক অবহিত এবং বন্ধুর প্রতি আনুগত্য ও ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি মনে করতেন এ প্রদক্ষেপ জাতীয় ঐক্য গঠনে বিরোধিতা করবে। এ সময় কমিউটিস্ট নেতা মনি সিংহের সাথে প্রথমবারের মতো উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করে তিনি বলেছিলেন। মনিদা একজন মানুষের ইচ্ছার সুযোগ নিয়ে এই সর্বনাশ পথ কেন বেছে নিলেন। আপনি জানেন, আমরা জনগণকে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আপীকার নিয়ে নির্বাচন ও যুদ্ধ করেছি। আপনাদের দল নিঃশেষ করে দেয়ার মানে দুর্দিনে দেশে এক দুর্বিপাক পড়বে। দ্বিতীয় কোন দেশপ্রেমিক শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। দেশ প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে গিয়ে পড়বে। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। তারা ইতিহাস সচেতন নয়। আর ইতিহাসের উপাত্ত হলো সাধারণ মানুষ। এই বাঙালীরা ১৯৫২ সালে, ১৯৪৫ সালে, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ সালে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭১ সালের সাথে তার বীর জাতি পরিচয় দিয়েছে। অতীতে

১ সিরাজউদ্দিন আহমদ, প্রধানমন্ত্রী তাজ ২০০৮, পৃ. ৭৬৯, ৭৭০।

বাঙালীরা দেশের স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের লড়াইয়ে এত বেশি রক্ত দেয়ানি। বাস্তবেও আমরা তাই দেখেছি, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে জাতি খুব দ্রুতগতিতে প্রগতিশীল থেকে প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

m`¶ ivR‰bwZK †bZv:

তাজউদ্দীন আহমদ অনন্য ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ হিসেবে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় লেখক সিরাজউদ্দিন (২০০৮) যাকে, একাধারে Political diplomats এবং Political demagogues বলে আখ্যায়িত করেছেন। একমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে তাজউদ্দীন আহমদ নিজস্ব মেধার বলে তিনি Political diplomats হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সুবিদিত গবেষক ও লেখক হারুন রশীদ বলেন, উপমহাদেশের তথা বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে যারা তাদের অবদানের জন্য রাজনৈতিক মহাকাশে নক্ষত্রের মতো নিজ জ্যোতিতে জ্বলজ্বল করবেন; বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমদ তাঁদেরই অন্যতম।[২]

Z¨vMx I cwikgx †bZv:

তাঁকে লেখক সিরাজউদ্দিন আহমেদ তাঁর গ্রন্থে (২০০৮) ভারতের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাথে তুলনা করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং কর্মস্থলে তিনি ছিলেন জ্যোতিবসু। ভারতের মহাত্মা গান্ধীকে যে আসনে সমীচীন করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে সেই আসনে সমীচীন হয়ে আছেন। তিনি নিজে বলেছেন,

"মুছে যাক আমার নাম, তবু বেঁচে থাক বাংলাদেশ"।

তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন ত্যাগী নেতা ও পরিশ্রমী নেতা।যিনি দলের প্রতি ছিলেন অতি মাত্রায় একনিষ্ঠ ও আন্তরিকতা সম্পন্ন এক অমায়িক ব্যক্তি। যিনি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে ছিলেন পরিচিত একনিষ্ঠ সৈনিক। অলি আহাদের বিদায়ের পর আওয়ামীলীগ থেকে ১৯৫৭ সাল হতে তাজউদ্দিন আহমদ আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যপ্রণালী প্রণয়নের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

---

২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৪-১০৭।

অপরদিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি, মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীসভার যাবতীয় কার্যাবলী বিশেষ করে কার্যাবলী লিপিবদ্ধ এবং দিকনির্দেশনা ইত্যাদি তিনি স্বহাতে সম্পন্ন করতেন।তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন । তাঁর আত্নজীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা তা দেখতে পাব। যার বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে অন্যতম গুণগুলো হলো সুশিক্ষিত, পন্ডিত এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন। দলের সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গরা যেমন নেতা, কমীরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করত। তাঁর মত দক্ষ সম্পাদক আওয়ামীলীগের মধ্যে ১৯৭৪ এর পর আর কেউ ছিল না। তাঁর সময় সমকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তার মত সুনিপুণ, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বিরল ছিল।

**সূক্ষ্ম , তীক্ষ্ণ, দূরদৃষ্টি ও আত্নবিশ্বাসসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা:**

তিনি ছিলেন এক অনন্য রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।ভবিষ্যতে কি ঘটবে বা কি হবে সে ব্যাপারে তিনি পূর্ব থেকেই আঁচ করতে পারতেন । যেমনট তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব সময়ে এবং যেমনটা তিনি উপলব্দি করতে পেরেছিলেন মৃত্যুর ব্যাপারে। তাঁর সহধর্মিণীর প্রতি নিম্নোক্ত উক্তিটি লক্ষ্য করলে তা বুঝা যাবে।

“ছেলে- মেয়ে নিয়ে তুমি সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে মিশে যেও । কবে দেখা হবে জানি না …মুক্তির পর”। এখানে মুক্তি বলতে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

তাজউদ্দীন আহমদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে থেকে আমরা তাঁর সূক্ষ্ম , তীক্ষ্ণ, দূরদৃষ্টি ও আত্নবিশ্বাস সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের ইঙ্গিত পেয়ে থাকি। যেমনটা লেখক হল সিরাজউদ্দিন আহমেদ তাজউদ্দীন আহমদ নিয়ে লেখা বই “প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ( ২০০৮) ” এ উল্লেখ করেছেন । তাজউদ্দীন আহমদের পদত্যাগের পর বরগুনার সংসদ সদস্য আসমত আলী সিকদার তাজউদ্দীন আহমদের বাসভবনে যান । তিনি তাজউদ্দীন আহমদের কাছে প্রশ্ন করলেন, তাজউদ্দীন ভাই দেশের কী হবে? তাজউদ্দীন আহমদ উত্তর দিলেন, “কি আর হবে, বঙ্গবুন্ধু ও শেষ হবে , আমরা শেষ হবো”।

gw³ h‡× ZvRDÏxb Avng`:

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসের সাথে তাজউদ্দীন আহমদের নাম জড়িত। ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে পরিচালনার প্রাণপুরুষ, সঠিক পথ প্রদর্শক ও প্রধান ভূমিকায় ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্সের দ্যাগ্যলের ভূমিকা পালন করেছেন। একথা সুবিদিত ও সবর্জন স্বীকৃত ভাষ্য যে, সম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধটি পরিচালনা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নামে। দীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী এ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্তিতিতে তাঁর পক্ষ হয়ে তাজউদ্দীন আহমদ অভূতপূর্ব ও স্মরণীয় প্রন্তিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

**স্বাধীনতা অর্জনে আশার বাণী সঞ্চারণ:**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে তাজউদ্দীন আহমদ ছিল অতি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী। তেঁতুলিয়ার ভজনপুর দেয়া ভাষণে তিনি সে দিকেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাকে পিছু হটাতে পারবে না। স্বাধীনতার ব্যাপারে তার উক্তিটি ছিল- "ছেলে-মেয়ে নিয়ে তুমি সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে মিশে যেও । কবে দেখা হবে জানি না ...মুক্তির পর"।

e½eÜ‡K †h K_v ejv n‡jv bv:

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসের কথা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কোনদিন বলার সুযোগ পেলেন না। আর বঙ্গবন্ধু কোন কথা তাজউদ্দীনের কাছে জানতে চাননি। তাজউদ্দনি আহমদের জীবনের সবচেয়ে অপেক্ষা ছিল বঙ্গবন্ধু কোনদিন জানতে চাননি যে, তিনি কি করে ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। এ ব্যাপারে ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একান্ত সাক্ষাৎকালে তাজউদ্দীন আহমদ মঈদুল হাসানকে তার আক্ষেপের কথা বলেছিলেন। মঈদুল হাসান তাঁরা মূলধারায় এ সম্পর্কে লিখেছেন।[৩]

৩ মইদুল হাসান, মূলধারা; ৭১ পৃষ্ঠা- ২৬৫-২৬৬

gw³h× cieZx Ae¯v:

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাজউদ্দীন আহমদকে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর ভার দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর হতে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক গুজব ছড়ানো হতে থাকে। ১৯৭৪ সালে ২৬ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাজউদ্দীন আহমদ অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বিশেষ করে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জাতি উপলব্দি করে, তাজউদ্দীন আহমদের পদত্যাগ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভুল ছিল। তাজউদ্দীন আহমদের শূণ্যস্থান পূরণ করার মতো নেতা আওয়ামী লীগে ছিল না। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠিত হলো। বাকশাল কমিটিতে তাজউদ্দীন আহমদের নাম নেই। তিনি বাকশাল গঠনের সাথে একমত ছিলেন না। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু তাঁর সাথে বাকশাল গঠন নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি। তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর সাথে নেই। দুর্গ অরক্ষিত। শত্রুরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের অনেককে হত্যা করে। তাজউদ্দীন আহমদ ইচ্ছা করলে মোশতাক সরকারের সাথে যোগ দিতে পারতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর রক্তে পা দিয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি (সিরাজউদ্দিন আহমেদ, ২০০৮)।

mkvmb, evsjv‡`‡ki Av_mvgwRK ivR‰bwZK DËiY I ZvRDÏxb Avng`:

রাষ্ট্র, সমাজ ও দেশের আপামর জনসাধারণ নিয়ে তাজউদ্দীনের চিন্তাধারা বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যা ছিল সীমাহীন প্রশংসার দাবিদার। জন্মগ্রহণের পর থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন একজন দিগ্বিজয়ী লড়াকু সৈনিক। তাঁর শৈশবকাল, বাল্যকাল, রাজনৈতিক জীবনাদর্শ ও প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল অনেক প্রশংসার, দাবিদার। তাঁর উপর বিভিন্ন সময়ে অর্পিত দায়িত্বসমূহ তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুচারুরূপে পালন করেছেন। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তরণে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা বিরল।

**সুশাসন ও স্বচ্ছতায় তাজউদ্দীন আহমদ:**

আজকের দিনে সুশাসন ও স্বচ্ছতা শব্দ দুটি নামেই যার তাৎপর্যতা ও কার্যকারীতা সীমাবদ্ধ। একটি সুন্দর, সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিনির্ধারকের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সর্বক্ষেত্রে আইনের শাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্বজনপ্রীতি পরিহার , ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে ওঠা, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি

পরিহার ও বহুমাত্রিক পক্ষপাত ও লাভ লোকসানের কথা না ভেবে কাঝ করতে হবে।যা কিনা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়া চালু করে ।যার ফলে আমরা দেখব রাষ্ট্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চত হবে । রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তাজউদ্দীন আহমদের স্বচ্ছতার প্রমাণ পাওয়া যায়, ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব[৪] লক্ষ্য করলে, তাহলে দেখতে পাব তিনি কতটা স্বচ্ছ ছিলেন। যা হল:-

| ব্যয় বা ব্যয়ের জন্য অনুমোদনের তারিখ | ব্যয়ের প্রকৃতি | ব্যয়ের পরিমাণ | | | প্রদানের তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | প্রদত্ত টাকা (১০) | বকেয়া টাকা (৯০) | ১০ ও ৯০ এর সমষ্টি (১০) | |
| (ক) | (খ) | (গ) | | | (ঘ) |
| ১৫/ ০১/ ১৯৭৩ | দলীয় মনোনয়ের জন্য আবেদন পত্রের ফরমক্রয় | ৫. ০০×৫. ০০ | | | ১২/ ০১/ ১৯৭৩ |
| ২১/ ০১/ ১৯৭৩ | দলীয় মনোনয়ন ফি | ৪০০. ০০×৪০০. ০০ | | | ২১/ ০১/ ১৯৭৩ |
| ২৬/ ০২/ ১৯৭৩ | ভোটান তালিকা ক্রয় | ৪২৮. ০০×৪২৮. ০০ | | | ২৬/ ০২/ ১৯৭৩ |
| ০৪/ ০৩/ ১৯৭৩ | মাইকভাড়া এবং মঞ্চ প্রস্তুত করার ব্যয় | ১৬৮০. ০০×১৬৮০. ০০ | | | ০৪/ ০৩/ ১৯৭৩ |
| | মোট | ২৫০৯. ০০/ - | | | |

A_%bwZK Dbqb:

অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনি নিয়েছিলেন যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ । তিনি ছিলেন একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান । তাঁর ছোটবেলা গ্রামীণ অর্থনীতির মাঝে কেটেছে । বাঙালী হাজার বছরের গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে তিনি বেড়ে উঠেছেন । গ্রামের দুঃখী মানুষ ও গরীব চাষা সম্পর্কে ভাবতেন এবং তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাতেন । যার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তার স্বহাতে লেখা ডায়রীতে তিনি তাঁর নিজস্ব ডায়রীতে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা, ধান ও চাল ও পাটের মূল্য লিখে রাখতেন । ১৯৪৭ সালের দিকে

৪ . সিমিন হোসেন রিমি, আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ , ২০০১, পৃষ্ঠা : ২৫৯

ইকোনমিক লীগ নামে যে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল তা ছিল তাঁর যুগান্তকারী উদ্যোগের ফসল। তাঁর নিকট সবচেয়ে উদ্বেগ এবং বড় বিষয় ছিল পাকিস্তানের জনসাধারণের আর্থিক মুক্তি। তাজউদ্দীন আহমদের অনন্য গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম হল, তিনি বাস্তবধর্মী বামপন্থী রাজনীতিবিদ তথা সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। কারণ আমরা তাঁর নিম্নোক্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। প্রথাগত বামরাজনীতিবিদগণ ভূমি জাতীয়কারণে বিশ্বাসী ছিলেন, অন্যদিকে তাজউদ্দীনের ভাবনা ছিল ঠিক তার বিপরীত। তিনি সবসময় ভাল-মন্দ ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। তাজউদ্দীন বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙালী কৃষক, কমবেশি ভূমির মালিক হতে আগ্রহী। এখানে ভূমি জাতীয়করণ সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে অন্য একটি বিশ্বাস অসুবিধা হলো ইসলামী আইন।[৫] যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশ পুর্নগঠনে সে সময় তাঁকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছিল। পাশাপাশি দেশীয়-বিদেশী সাহায্য ও সম্পদের প্রয়োজন ছিল বেশি। তাঁর সামনে ছিল পাহাড় পরিমাণ বিপদ। অর্থনীতির এ বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এর মোড় গোড়ানো ছিল এক অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোন হতাশা বোধ করেন নি। বরং সুনিপুণভাবে তার মোকাবেলা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ গুলো ছিল নিম্নরূপ।

ক. জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। খ. কর আরোপ নির্ধারণ করা।

তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, নতুন করা আরোপ করলে জনগণের দুঃখ দুর্দশা ও কষ্ট বৃদ্ধি পাবে। তাই তিনি নতুন করারোপ না করে অন্যদিকে দৃষ্টি নিবন্ধন করেন। এ খালিস্থান পূরণের জন্য ভিন্ন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি কেন্দ্র রাষ্ট্রের সাথে তাল মিলানোর জন্য বিদেশী সাহায্য সমর্থন করেছিলেন। যদিও তিনি শুরু দিকে এর কিছুটা বিরোধী ছিলেন।

Lv`¨ msKU wbim‡b hMvšiKvix D‡`¨vM:

খাদ্য সংকট দূর করার জন্য তিনি সকলকে রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে নিরহ মানুষকে বাঁচানোর জন্য দলমত নির্বিশেষে কাজ করার আহ্বান করেছিলেন। ২৩ অক্টোর ১৯৭৪ বিদেশ থেকে ফিরে ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিক সম্মেলনে তাজউদ্দীন আহমদের একটি বক্তব্যের মাধ্যমে যেটা ফুটে উঠেছিল[৬]। সফল অর্থমন্ত্রী

৫ সিরাজউদ্দিন আহমদে, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ২০০৮, পৃ. ৭৬২।

৬ সিমিন হোসেন রিমি, আমার ছোট বেলা ১৯৭১, ২০০১, পৃ (২৪৯-২৫১)

জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, বর্তমান জাতীয় দুর্যোগকালে উট পাখির মত বালিতে মাথা গুঁজে থাকলে চলবে না। বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। অবিলম্বে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে জাতীয়ভাবে, খাদ্য সংকটের বাস্তব সমাধানের পথে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি গতকাল ঢাকা বিমান বন্দরে ১৯৫৬ সালের সর্বদলীয় খাদ্য কমিটির কথা উল্লেখ করেন। অর্থমন্ত্রী আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, মানুষ না খেয়ে মরছে এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। এর অবসান ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, মাটি আর মানুষ নিয়ে দেশ-বাংলাদেশ এখন সার্বভৌম, তার মাটি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু মানুষ না থাকলে কাকে নিয়ে রাজনীতি, কারজন্যই বা রাজনীতি। মানুষ যখন মরে যাচ্ছে তখন নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা যায় না। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে যারা ব্যর্থ হবে তাদের ব্যক্তি নির্বিশেষে ছাটাই করা দরকার। এমনকি আমি যদি হই আামকে ও বাদ দেয়া উচিত। মোটকথা যে কোন মূল্যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মত বর্তমান সংকট মোকাবেলা করে মানুষ বাঁচাতে হবে। দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, কেউ অভিজাতবিপণী কেন্দ্রে মার্কেটিং করবে আর কেউ না খেয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে এ অবস্থা চলতে দেয়া যাবে না। তিনি আরো বলেন, যাঁরা আজ না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে পথে ঘাটে পড়ে মরছে তাঁরা আমাদের মানবতাবোধের প্রতি বিদ্রুপ করে বিদায় নিচ্ছে। তিনি জানান যে, বিদেশ সফর কালে তিনি বিদেশী সংবাদ পত্রে বাংলাদেশ অনাহারে মৃত্যুর সচিত্রখবর পাঠ করে ব্যথিত হয়েছেন। লন্ডনে বৃটিশ টেলিভিশনে তিনি বাংলাদেশে অনাহারের মৃত্যু এবং এরই পাশাপাশি এক শ্রেণীর মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার দুই বিপরীত মর্মান্তিক ছবি দেখেছেন। তিনি দেখেছেন ঢাকার রাজপথে না খেয়ে মরে যাওয়া মানুষের লাশ আর তারই পাশাপাশি নাইট ক্লাবে এক শ্রেণীর মানুষ বেআইনীভাবে আমদানিকৃত দামি বিদেশী মদ এবং আস্ত মুরগি খাচ্ছে। তিনি জানান যে, লন্ডনে বসে নিজ দেশের দুই বিপরীত ও অমানবিক দৃশ্য দেখে তিনি মর্মাহত ও লজ্জিত হয়েছেন। তিনি দুঃখ করে বলেন, দেশের মানুষ যখন খেতে না পেয়ে মরছে, তখন কালো টাকার মালিকরা তাদের সম্পদ আরো বাড়ানোর জন্য অবৈধ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। তিনি বলেন, ভিক্ষাবৃত্তি সকল অধঃপতন ও দুর্নীতির মূল কারণ। আমরা স্থায়ীভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হতে পারি না। আমাদের দেশে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। সেই সম্পদ আহরণ করে গণমানুষের মধ্যে সুষম বন্টনের মাধ্যমে আমাদের সুষম জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজ করে যেতে হবে। যদিও অনেক আগ থেকেই আমাদের তা করা উচিত ছিল। অর্থমন্ত্রী দেশের বিত্তবান লেখকদের কৃচ্ছ্রতা সাধনের জন্যেও আহবান জানান। তিনি বলেন, যাঁদের নাই তাদেরকে কৃচ্ছ্রতা সাধনের কথা বলে মরতে বলতে পারি না। আমরা সবাই

সহানুভূতিশীল হতেও পরিস্থিতির বেদনা কিছুটা প্রশমিত হত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া মানুষের দুঃখের অবসান হয়না। (সংবাদদাতা, শৈলকুপা, যশোর, ৭ মার্চ)। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমেই মানুষের দুঃখের অবসান হয়না। তার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আর এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য খেতে, খামারে, কলে, কারখানায় একতাবদ্ধ হয়ে কাঠোর পরিশ্রম করার প্রয়োজন। গত ৪ মার্চ শৈলকুপায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের একশত চারতম শাখা উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দানকালে বাংলাদেশে সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন। (মার্চ ১৮, ১৯৭৮ সোমবার: দৈনিক ইত্তেফাক )

evsjv‡`‡ki Av_mvgwRK †c¶vcU:

বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে এ বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থা খুবই নাজুক প্রকৃতির ছিল। একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়অবস্থান সম্বন্বিত রূপ হল আর্থসামাজিক অবস্থা। যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর কিছুটা উন্নতি লাভ করছিল । কিন্তু একটা সময় বিভিন্ন কারণে তা আবার ভিন্নরূপে রূপায়িত হল।

**বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উত্তরণ:**

বাংলাদেশের সমাজের প্রতিটি স্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা বাস্তবায়ন করতে তাজ উদ্দিন আহমদের চিন্তাধারা, আদর্শ, গণতন্ত্র , সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা বাস্তবায়ন অত্যন্ত আবশ্যক। শোষণহীন ক্ষুধামুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য।

**শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াকু সৈনিক:**

সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, শ্রেণী বৈষম্যহীন ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাজউদ্দীন আহমদের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় পাওয়া যায়[৭]। ১২ অক্টোবর ।

৭। সিমিন হোসেন রিমি, আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজ উদ্দিন আহমদ , ২০০১, পৃষ্ঠা : ২১২-২১৭

প্রত্যুষে উঠেই আবার সদলবলে তেঁতুলিয়ার পথে রওনা হলাম। সারাদিন পথ চলে তেঁতুলিয়ার মুক্তাঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলাম। প্রায় বিকেল ৩-৩০মিনিটে। মধ্যাহ্নভোজন শেষ করেই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। নেতার আগমনে আনন্দে উৎফুল্ল মুক্তিযোদ্ধারা চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে যুদ্ধক্ষেত্রেই নেতাকে দিল সামরিক গার্ড অব অনার।ওদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বললেন – "ভায়েরা আমার! আগের বার যখন আমি এসেছিলাম তখন আপনারা অনেক পিছনে ছিলেন ।কিন্তু আজ এই মূহুর্তে তেঁতুলিয়া ভজনপুর ও কোটগাছিসহ প্রায় সাড়ে ছয় শত বর্গমাইল এলাকামুক্ত করে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত আপনাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছে । আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর আর কোন শক্তিই আমাদের এ অগ্রযাত্রাকে রোধ করতে পারবে না । প্রতিটি সৈন্য সেনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আমাদের বহু স্বাদের ধর্মনিরপেক্ষতা ও শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলতে পারবই এ বিশ্বাস আমার আছে । কঠিন আত্নবিশ্বাস নিয়ে আপনারা এগিয়ে চলুন" ।

evsjv‡`‡ki ivR‰bwZK Dbqb:

রাজনীতি হল এমন একটি শাসন পক্রিয়া যেখানে বিভিন্ন দলের অংশগ্রহণ থাকে । তারা ক্ষমতা শক্তিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে । বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তরণ বিভিন্ন ঝড়-ঝাঙা বা প্রতিকূলতার মাঝে উন্নতি লাভ ঘটেছে । এ রাজনৈতিক উত্তরণ শুরু হয়েছিল তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা থেকে । মূলত ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তরণ শুরু হয় । তারপর বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম হল । ৬৯' এর গণঅভ্যুত্থান, ৬দফা আন্দোলন, ৭০' এর নির্বাচন, ৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন এবং সর্বশেষ রাজনৈতিক উত্তরণের চূড়ান্ত সফলতা লাভ পায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে । যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ । যার নৈপূন্য ও দক্ষতার বলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তরণ উন্নতি লাভ করেছিল ।

**ইতিহাসের পাতায় ও লিখনীতে তাজউদ্দীন আহমদ:**

তাজউদ্দীন আহমদের মত ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে বিরল।ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে তাঁর মত রাজনৈতিক মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব খুবকমই আছে ।অন্যদিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে

পাব বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেকটাই তাঁকে অবহেলা করা হয়েছে। যা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক হয়ে আছে ।এটা অত্যন্ত স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, যে জাতি গণীজনদের কদর করে না, সে দেশে গুণীজন জন্ম নেয় না। যে জাতি তাদের ইতিহাসে তাদের গুণীনদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে না । অথবা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেছে ভিন্ন ইতিহাস । তিনি ইতিহাস থেকে নিজেকে অনেকটা দূরে রাখতেন। লেখক সিমিন হোসেন রিমির বর্ণনায়[৪] তা ফুটে উঠেছে এবং তাজউদ্দীন আহমদের নিমোক্ত উক্তিতে। তার মেয়ে সিমিন হোসেন রিমি বর্ণনা করছেন । বাবা তাঁর মাত্র ৫০ বছরের জীবনে কোন কাজে, কোন কিছুতেই নিজের কৃতিত্ব দাবি করেন নি। কর্তব্য বিবেচনায় রেখে নিঃস্বার্থভাবে শুধু কাজই করে গেছেন যা শুধুমাত্র বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।সে কারণেই হয়ত মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে তিনি তাঁর সহকর্মীদের সহজেই বলতেন ,

“আসুন, আমরা এমনভাবে কাজ করি ভবিষ্যতে যখন ঐতিহাসিকেরা বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করবে তখন যেন খুঁজে পেতে আমাদের কষ্ট হয়”।

তাজউদ্দীন আহমদের জীবনকর্ম, জীবনবৃত্তান্ত, জীবনাদর্শন নিয়ে যে সকল ব্যক্তিবর্গ বই , প্রবন্ধ, সাময়িকী এবং গবেষনা নিয়ে কাজ করেছেন তাদের সংখ্যা খুবই কম।যারা করেছেন তার কিয়দাংশ এখানে তুলে ধরা হল।সিরাজউদ্দিন আহমেদ তাজউদ্দীন আহমদ নিয়ে একটি সম্পূর্ণ বই লিখেছেন। সেই বইটির নাম হল, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ( ২০০৮) । তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে তাঁর মেয়ে সিমিন হোসেন রিমি কর্তৃক তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে।আর তা হল, ( ক) আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ ( ২০০১) , ( খ) তাজউদ্দীন আহমদ- আলোকের অন্তধারা, ( গ) তাজউদ্দীন আহমদ – ইতিহাসের পাতা থেকে। তাজউদ্দীন উদ্দিন আহমদের বোনের ছেলে মাহবুব করিম কর্তৃক সম্পাদিত: তাজউদ্দীন আহমদের স্মৃতি এ্যালবাম এবং তাজউদ্দীন আহমদ- নেতা ও মানুষ। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান তাজউদ্দীন আহমদ নিয়ে গবেষনা করেছেন। আর তা হল এরূপ আকারে প্রকাশিত হয়েছে, তাজউদ্দীন আহমদ স্মারক বক্তৃতা ১৯৯০: তাজউদ্দীন আহমদ সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্র ভাবনা, ড. আতিউর রহমান । মুজিবনগর সরকারের সংস্হাপন সচিব মোহাম্মদ নরুল কাদেরের লেখা “আমার

৮ . সিমিন হোসেন রিমি, আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজ উদ্দিন আহমদ , ২০০১, ভূমিকায়; পৃষ্ঠা : ০২

একাত্তর" গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দিন আহাদের অবদান তুলে ধরেছেন। মঈদুল হাসান লিখেছেন , মূলধারা'৭১। তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু ছিলেন কামরুদ্দিন । তিনি তাঁর লেখা "মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্বাস" গ্রন্থে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক ভূমিকার কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে তুলেছেন । বদরুদ্দিন উমর ও লিখেছেন তাঁর সম্পর্কে প্রমুখ। ইতিহাসে তিনি এখনও উপেক্ষিত। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান ব্যর্থ জাতি হিসেবে আমরা এখনোও স্বীকৃতি দিতে পারেনি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

mkvmb I evsjv‡`‡ki Av_-mvgvRK ivR‰bwZK DËi‡Yi eZgvb Ae¯v:

বর্তমানে আমরা স্বাধীনতার ৪২ বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছি । আমাদের দৈনিক জাতীয় পত্রিকা গুলো লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের সুশাসন এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক উত্তরণ কতটা নিম্নে পৌঁছতে পারে । যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল । জাতি ও আমাদের নের্তৃবর্গ সে পথ থেকে দূরে সরে এসেছে । এ থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় স্বাধীনতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আসা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা অবদান রেখেছে তাঁদের মতাদর্শ অনুসরণ করা তাহলে সোনার বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষিত হবে ।

RwZ wn‡m‡e Avgv‡`i e¨_Zv I `ejZv:

সঠিক ইতিহাস উদঘাটনে ও জানার আগ্রহতে আমাদের রয়েছে চরম উদাসীনতা । জাতি হিসেবে আামদের আছে বিভিন্ন ব্যর্থতা ও দুর্বলতা । আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল হল ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৫ সালে জেল হত্যা ঘটনা । বর্তমানে সবচেয়ে প্রকট সমস্যা হল, আমরা সে সকল ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে তেমন একটা অবগত নই । অত্যন্ত পরিতাপ ও দুঃখের বিষয় এই যে, সফল প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে আমরা এখনোও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি । বর্তমান প্রজন্ম ও সে সম্পর্কে অনেকটা অবহলো করে । একদিকে আমাদের রয়েছে পাঠ্যক্রম গত দুর্বলতা অন্যদিকে আমাদের রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিহাস বিকৃত । আমরা জাতি হিসেবে তাঁর মত একজন মেধাবী মননশীল চিন্তাধরা ও দূরদর্শী সফল ব্যক্তিকে মূল্যায়ন দেইনি, এবং তাঁর ব্যাপারে জানার চেষ্টা করেনি । ছোটকাল থেকে তিনি চিন্তাশীল ও কর্তব্যপরাযন ও

উন্নতর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এ ব্যাপারে তরুণ প্রজন্মের সচেতন হয়ে উঠলে ভবিষ্যত বাংলাদেশ এন হবে যেমনটা তাজউদ্দীন আহমদ।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ও ভারতীয় উপমহাদেশে তাজউদ্দীন আহমদ একটি অনন্য ব্যক্তিত্বের নাম। যিনি তাঁর সুদৃঢ় প্রজ্ঞা মেধার বলে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে একটি সফল নেতৃত্ব প্রদান করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। সে সময় বিশ্বের পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) এবং আমেরিকার মধ্যে চলছিল স্নায়ু যুদ্ধ। তন্মোধ্যে বিশ্বের অপর দু' শক্তি আমেরিকা ও চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল। স্বয়ং জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট শান্তি প্রতিষ্ঠার বাহক হয়েও এর বিরুদ্ধে ছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ অভ্যন্তরীণ ও বর্হিঃবিশ্বের সকল সমস্যা মোকাবেলা করে একটি সুন্দর স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এবং তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী সময় আমরা যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখব যে, তাঁর সময় সুশাসন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক উত্তরণে তাঁর অবদান অনেক এবং তাঁর মতাদর্শ ছিল সুশাসন ও আর্থসামাজিক রাজনৈতিক উত্তরণে বাংলাদেশের জন্য বাস্তবসম্মত পন্থা। তাঁর মতাদর্শ অনুসরণ করলে ভবিষ্যতে একটি সুখী, সমৃদ্ধশীল ও সোনার বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। যেখানে থাকবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং জনগণের স্বাধীন মতামতের অধিকার। সর্বোপরি, উপমহাদেশের রাজনীতির অহংকার বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমদ প্রতিনিয়ত এক আদর্শ মহামানবের প্রতিমূর্তি।

**তথ্যসুত্র:**


- তাজউদ্দিন আহমদ পাঠচক্র: ১২ (২০১২), পরিচালনায় তাজউদ্দিন আহমদ পাঠচক্র পর্ষদ, আলোচক: সিমিন হোসেন রিমি ও কিবরিয়া
- কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদ: বাংলাদেশ অভ্যুদয় এবং তারপর
- সিমিন হোসেন রিমি, আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজ উদ্দিন আহমদ
- সিমিন হোসেন রিমি, তাজউদ্দিন আহমদ ইতিহাসের পাতা থেকে
- সিমিন হোসেন রিমি, তাজউদ্দিন আহমদ- আলোকের অন্তধারা
- তাজউদ্দিন আহমদ স্মারক বক্তৃতা ১৯৯০: তাজউদ্দিন আহমদ সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্র ভাবনা, ড. আতিউর রহমান
- তাজউদ্দিন আহমদ: : নি: সঙ্গ সারথী- তানবীর মোকাম্মেল (ভিডিও প্রামাণ্য চিত্র)
- তাজউদ্দিন আহমদ- নেতা ও মানুষ- মাহবুব করিম
- তাজউদ্দিন আহমদেরস্মৃতি এ্যালবাম - মাহবুব করিম

I‡qe Z_¨mÎ:

- www.tajuddinahmad.com/tajuddinslife.htm.